চট্টগ্রাম বৃহস্পতিবার ১৫ ডিসেম্বর ২০২২

দৈনিক পূর্বকোণ

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

রেজিঃ নম্বর-চ-৮৯ । । ৩৭তম বর্ষ ১১৪তম সংখ্যা । । ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ । । ২০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি । । Thursday 15 December 2022 । । ৮ পৃষ্ঠার মূল্য ৭ টাকা

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

এবারের বিজয় দিবস কেন অনন্য

ড. মোহীত উল আলম

কাল একান্নবার বিজয় দিবস পার করবে বাংলাদেশ। পদ্মা সেতু হয়ে গেছে। আরো অনেক সেতু তৈরি হয়ে গেছে। চোখে পড়ার মতো ব্যাপক উন্নতির দেশ বাংলাদেশ। রাস্তাঘাট আর জনপদের এত বিস্তৃতি হয়েছে যে অবাক হতে হয়। প্রায় ফেইসবুক বা মেসেঞ্জারে কেউ কেউ কোন একটা নতুন রাস্তার ভিডিও পাঠিয়ে দেন, মন্তব্য থাকে, দেখে মনে হয় বিদেশ, অথচ আমারই দেশ। এক অর্থে এখন যে বাংলাদেশ আমরা দেখছি, এই বাংলাদেশইতো আসলে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি ক্ষমতায় থাকবে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে ও শাস্তি কার্যকর হবে, শিক্ষায়তন বাড়বে, ব্যবসা বাণিজ্য হবে, প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে, এবং দৃশ্যমানভাবে ভৌতকাঠামোগত উন্নতি হবে। আরো উন্নতির কথা বললে, মানবসম্পদের উন্নতি, কৃষি উৎপাদনের আধুনিকায়ন, গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, চিকিৎসাসেবার উন্নতি, মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নতি, বয়োজ্যেষ্ঠ জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা বর্ধিতকরণ এবং প্রযুক্তি-নির্ভর যোগাযোগের ব্যাপক উন্নতিসাধন- এই সবইতো আমরা দেখতে চেয়েছিলাম, এবং এ সব মিলে বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশের অবস্থান দখল করার পথে পরিচালিত হচ্ছে।

অবশ্য এ ছবিটির বিপরীতে আমাদের শুরুর দিনগুলোর কথা চিন্তা করলে বোঝা যাবে এখনকার উন্নতির পরিক্রমা। বর্তমান চোখের সামনে থাকে বলে অনেক সময় এটির গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি না। বর্তমানটা অতীত হয়ে গেলেই আমরা বুঝতে পারি এর গুরুত্ব। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার এ লেখাটায় আমি একটা কথা সামনে নিয়ে আসতে চাই, আর সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি বিভ্রান্তিকর প্রত্যয়ের কিভাবে সংশোধন হলো তার আলোচনা। বিভ্রান্তিকর প্রত্যয়টি হলো, আন্তর্জাতিক ও দেশীয়ভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে দেখা হয়েছে আর্ত মানবতার সংকট হিসেবে, কিন্তু এর প্রত্যক্ষ যুদ্ধের চারিত্র সমানভাবে প্রতিভাত হয়নি কিংবা গুরুত্ব পায় নি। কেবলমাত্র বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধা চরিত্রটি পুনঃস্থাপিত হয়, এবং কিভাবে হয়েছে তার আলোচনা এখানে করেছি। মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল যেহেতু বিজয় দিবস, সে জন্য এই দিবসে এই আলোচনাটা করা যুক্তিযুক্ত মনে করছি।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর- দুইশত ছেষট্টি দিন। ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী এক মুক্তিযুদ্ধ হয়ে গেল বাংলাদেশে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ঢাকার রেসকোর্সে প্রদত্ত প্রথম ভাষণে বললেন, "আমি আশা করি, দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে আমার আবেদন, যে আমার রাস্তা নাই, ঘাট নাই, আমার জনগণের খাবার নাই, আমার মানুষ গৃহহারা, সর্বহারা, আমার মানুষ পথের ভিখারি, তোমরা আমার মানুষকে সাহায্য কোরো। মানবতার খাতিরে আমি তোমাদের কাছে সাহায্য চাই।" বঙ্গবন্ধুর আবেদনের সূত্র ধরে নয়, কিন্তু এমনিতেই এ সময়ে বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়িও' বলা হয়েছিল। আমেরিকার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এ কথাটা চাউর করেছিলেন, কারণ বাংলাদেশের জন্মকে তৎকালীন মার্কিনী পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় হিসেবে দেখেছিলেন। খানিকটা এই কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীর কাছে প্রতিভাত হয়েছিলো প্রধানত মানবতার সংকট হিসেবে। তবে সে সময়ে মার্কিনী সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে প্রচার করলেও আমেরিকার সাধারণ জনগণ বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। ১ আগস্ট, ১৯৭১ সালে নিউ ইয়র্ক শহরের ম্যাডিসন স্কোয়ারের কেন্দ্রে রবিশংকর, আল্লারাখা, জর্জ হ্যারিসন, বব ডিলান প্রমুখ আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান সংগীত শিল্পীরা 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' শিরোনামে যে চ্যারিটি শো করলেন, তাতে তিনটে লং প্লে ডিস্ক তৈরি হয়, এবং প্রত্যেকটির প্রচ্ছদে ছবি থাকে একটি ভিক্ষার বাটির পাশে বসে থাকা একটি উলঙ্গ শিশু। কাজেই বাংলাদেশ যখন স্বাধিন হয় এ ভগ্নদূত শিশুটির চিত্রকল্পটিই নতুন রাষ্ট্রের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন কবি এ্যালেন গিন্সবার্গ কলকাতায় আসেন ত্রাণশিবির দেখার জন্য। দেখে তিনি আঁৎকে ওঠেন, এবং 'সেপ্টেম্বর অন যেশোর রোড' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতায় হৃদয়স্পর্শী ভাষায় ত্রাণশিবিরে অবস্থানরত শরণার্থীদের মানবেতর জীবন যাপনের অপূর্ব বাস্তব সব ছবি ফুটিয়ে তোলেন। বব ডিলানের সঙ্গী জোয়ান বায়েজ ১৯৭২ সালে বের করলেন তাঁর 'বাংলাদেশ, বাংলাদেশ' শীর্ষক গানটি, যেটি থিম এবং সুরের ধারায় 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এ গাওয়া জর্জ হ্যারিসনের বিখ্যাত গান 'মাই ফ্রেন্ড কেইম টু মি উইদ স্যাডনেস ইন হিজ আইজ ও বাংলাদেশ' গানটির মতোই বিশ্বব্যাপী সমান জনপ্রিয়তা পায়। এ দুটি গানেরই থিম হলো এ্যালেন গিনসবার্গের কবিতার মতোই- দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত নির্যাতিত মানুষের মানবেতর জীবনযাপনের করুণ চিত্র। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ইউরোপ আর আমেরিকার রাজধানীগুলো সফরে বের হোন বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া প্রায় এক কোটি শরণার্থীর ভরণপোষণের জন্য চাঁদা তুলতে। ফলে শুরু থেকেই বিশ্বব্যাপী নতুন জন্মলাভ করা দেশ বাংলাদেশ পরিচিত হয়ে ওঠে পৃথিবীর সর্বনিম্ন দারিদ্র-ক্লিষ্ট দেশ হিসেবে। বাংলাদেশ এবং ক্ষুধা প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ হবার শুরুর দিকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র চিত্রকল্পটি আমাদের মনে খোঁচা জাগালেও, আমরা তখনো বুঝতে পারিনি এই সর্বপ্রচারমুখি চিত্রকল্পটি আসলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী দিকটি, বিশেষ করে স্বাধীনতা লাভ করার জন্য আমরা যে অকাতরে যুদ্ধে নিরত ছিলাম, যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হচ্ছিলাম, সে দৃশ্যপটটি একান্তই নেপথ্যে চলে যায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে একটি সহিংস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ চলছিলো- বাঙালি বনাম পাকিস্তানি ও তাদের দেশীয় তাঁবেদার গোষ্ঠীর মধ্যে- সে সম্পর্কে বিশ্ব পুরোপুরি সজাগ যেন ছিল না। বরঞ্চ শরণার্থী ইস্যুটাই সর্বত্রই ব্যাপক মনোযোগ পায়। অনেকটা যেরকম রোহিঙ্গা শরণার্থী নিয়ে এখন হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা যেমন গুরুত্ব পাচ্ছে শুধু মানবতার সংকট হিসেবে, কিন্তু এটা যে বাংলাদেশের জন্য কীরকম সামাজিক, রাজনৈতিক ঝামেলা তৈরি করেছে সে সম্পর্কে বিশ্বশক্তিগুলো নানারকম প্যাঁচের মধ্যে আছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়েও এমন একটি পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হয়েছিলো যে আর্ত মানবতার ডাক বিশ্ব শুনেছে, কিন্তু বাঙালির স্বাধীনতার ইস্যুতে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সরবতার চেয়ে নিরবতাই বেশি ছিলো। ফলে হয়ে গেল কি, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক চেতনার কবর হয়ে যাবার কথা থাকলেও ঐ সাম্প্রদায়িক চেতনাই বাংলাদেশ-স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নানাভাবে সমাজকে ঘায়েল করতে থাকে। এমন হলো যে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংগ্রামী চেতনা লুপ্ত হতে থাকে, এবং এই অবলুপ্তির করুণ পরিণতি স্বরূপ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে নিহত হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, এবং ঐ বছরেই ৩ নভেম্বর শেষ রাতে ঢাকার কেন্দ্রীয় জেলে নিহত হন জাতীয় চার নেতা: সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, কামরুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী।

'তলাবিহীন ঝুড়ি'র প্রবচনের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হবার ঘটনা। অর্থাৎ ত্রাণকামীর ভাবমূর্তিটাই বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার ভাবমূর্তিটি কণ্টকাকীর্ণ থেকে অধিকতর কণ্টকাকীর্ণ হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের স্বাক্ষরবাহী অত্যন্ত জনপ্রিয় দু'টো কবিতার কথা যদি ধরি তা হলে শামসুর রাহমানের 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কিংবা নির্মলেন্দু গুণের 'স্বাধীনতা এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতা দু'টির কথা বলতে হয়। কবিতা দু'টো ভালো করে পড়লে বা একই অর্থে সৈয়দ শামসুল হকের 'যতদিন না লেখা হয় ইতিহাসের নতুন এক পাতা' পড়লে দেখা যায় তিনটে কবিতায় একধরনের দর্শকীয় ভঙ্গিতে লেখা, মুক্তিযুদ্ধের বহ্মমানতা, জাজ্জ্বল্য বাস্তবতা এ কবিতাগুলোতে অনুপস্থিত। একধরনের কাতরতা আছে, শোকাভিভূত অনুভূতি আছে, কিন্তু খোদ যুদ্ধরত বীর্যবান পুরুষের সংগ্রামী চিত্তের প্রকাশ নেই। নেই নারীর যুদ্ধমান শারীরিক ভাষার প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে যোদ্ধা-কবি কায়সার হকের কবিতার কথাও উল্লেখ করা যায়। তিনি সরাসরি যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কবিতাগুলিতে খোদ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি নিস্পৃহ ভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি ইংরেজিতে লেখেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত কবি, কিন্তু তাঁর অনেকগুলো কবিতায় তাঁর অনুভূতি দর্শকের অনুভূতির মতো। একটা কবিতায় তিনি বলছেনও যে এখন থেকে তিনি শুধু চোখ দিয়ে দেখবেন, কিন্তু কিছু করবেন না: "আইল জাস্ট টেইক থিংজ ইজি / লেট আইজ ওয়াস্তার হোয়ের দে উইল," (সিনিয়র সিটিজেন)।

আমার একটা ধারণা হয়েছে, ধারণাটি আবার ভুলও হতে পারে, যে ঐ সময়ে, অর্থাৎ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর চিন এবং ভারত-পাকিস্তান মিলে যে কঠিন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমীকরণ চলছিলো, সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সেভাবে গুরুত্ব পায়নি। যদি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখি, ভারত যতটা না শরণার্থী নিয়ে বিচলিত হতে বাধ্য হয়েছিলো, ততটা যুদ্ধের সংঘর্ষতা নিয়ে তাকে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়নি। কিংবা রাজনৈতিকভাবে এই হিসাবও তাকে মাথায় রাখতে হয়েছিলো যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোন না কোন ভাবে যেন তার অভ্যন্তরের প্রদেশগুলোর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীর চিন্তা উসকে না দেয়। ইন্দিরা গান্ধী নিজেই ক্ষুরধার রাজনীতিবিদ ছিলেন, ফলে ভারতের শরণার্থী সমস্যা নিয়ে তাঁর জোরালো ক্যাম্পেইন আন্তর্জাতিকভাবে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। আগেই বলেছি, তুলনাটা হলো এরকম যে রোহিঙ্গা সমস্যার মানবিক দিকটা নিয়ে বিশ্বরাজনীতির কুশীলবেরা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এটি যে কী সমস্যা তৈরি করছে সেদিকে দৃকপাত নেই। তবে যেটি বলতে চাইছি, আমরাও ভিতর থেকে এই প্রেক্ষাপটটি গ্রহণ করেছি, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধকে প্রাধান্য না দিয়ে মানবতার সংকটটি বড় করে দেখেছি। সেজন্য মুক্তিযুদ্ধ করেও আমরা মুক্তিযুদ্ধের দর্শক হয়ে রইলাম। বাইরে রইলাম, ভিতরে রইলাম না।

বাংলাদেশের ইতিহাসের এই ভ্রান্তিজনিত ব্যাখ্যা শোধরানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র অপবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের রণ-ঐতিহ্যের ওপর দেশকে দাঁড় করাতে এগিয়ে আসেন শেখ হাসিনা। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার দ্বিতীয় দফায় একটানা ক্ষমতায় থাকার বারো বছর শেষ করতে চলল। ফলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার সময় তাঁর পাওয়া হচ্ছে। তবে তাঁর এযাবৎ শাসনকালকে প্রথমে মূল্যায়ন করতে হবে তিনি যে নিরন্ন জনগণের মুখে অন্ন তুলে দেবার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন সেজন্য নয়, বরঞ্চ এ জন্য যে শুরুতে যে বলেছিলাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' হিসেবে নয়, বরং আর্ত-মানবতার সংকট হিসেবে দেখার যে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিলো, এবং সেজন্য মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা, রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের বিনিময়ে দেশ স্বাধিন করা, সে প্রত্যয়টি যে চাপা পড়ে গেছিলো, শেখ হাসিনা তাঁর একক প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধের বিভ্রান্তিজনিত এই ইতিহাসটুকু ঠিক করে নেন। তখন স্পষ্ট হয়, স্বাধীনতাবিরোধী যে সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিলো, তাদের একাত্তরের দেশ ও মানবতা বিরোধী সহিংস কার্যকলাপের জন্য শাস্তি বিধান না করলে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটটা পরিষ্কার হয় না। অর্থাৎ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তিবিধান না করা পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যাথার্থ ফুটে ওঠে না। শেখ হাসিনা দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী হয়ে এই কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদন করেন, এবং এখনও করছেন। ইতিহাসের কার্যকারণের সূত্র যদি কিছুটা বোঝা যায়, তা হলে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে রাজনীতির গতিপ্রকৃতির সঙ্গে অর্থনীতির ওঠানামার সম্পর্ক নিবিড়। তাই লক্ষ করার মতো ব্যাপার হলো এটি যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি বিধানের সাথে সাথে সমান্তরালভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বাড়তে থাকে, এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও দৃশ্যমানতা বেড়ে যায়। এভাবেও বলা যায় যতদিন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি হয়নি, ততদিন বাংলাদেশ দারিদ্র-মুক্তও হতে পারেনি, এবং উন্নয়নের ছোঁয়াও পায় নি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সম্যক উপলব্ধি এখানে নিহিত যে বিচারিক-প্রধান শাসন কাঠামোর সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সংযোগ খুঁজে পাওয়া। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে নিরন্ন মানুষকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা বোঝায় না, বোঝায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, যেটি হবে দুর্নীতিমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক। যুদ্ধপরাধীদের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করার পর ক্যাসিনো-নির্ভর দুর্নীতিসহ সকল দুর্নীতির মূলে কুঠারাঘাত করলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জোড়া সংখ্যার দিকে যেতে পারে। তখন নিরন্ন মানুষের খাওয়ার উপায় এমনিতেই বের হয়ে আসবে। শেখ হাসিনার রাষ্ট্রনায়কোচিত এই প্রত্যয়টি মুক্তিযুদ্ধকে সঠিক কাঠামোয় যেমন দাঁড় করিয়েছে, তেমনি সেটার যথার্থ মূল্যায়নও হয়েছে। এই রাস্তায় (মুক্তিযুদ্ধের চেতনাস্পৃষ্ট সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা) চলতে গিয়ে তাঁর কোন দোদুল্যমানতায় ভোগার দরকার নেই, কারণ জনসমর্থন তাঁর সাথে থাকবে, এবং মুক্তিযুদ্ধের যথার্থতাও স্থাপিত হবে। তবে বর্তমানে ওপরে বর্ণিত প্রেক্ষাপট বেশ খানিকটা বদলে গেছে। পরপর তিনটা বছর কোভিড অতিমারীর আক্রমণে বিশ্ব যখন পর্যুদস্ত, তখন বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে এই মহামারির শিকার না হলেও তার অর্থনীতিতে পড়েছে বিশাল টান। ফরেন রিজার্ভ কমতে কমতে বিপজ্জনক সীমানার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। উপরন্তু রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার ফলে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় অর্থনীতির কোমর ভেঙ্গে গেছে বলা যায়। তার ওপর যোগ হয়েছে আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তাগিদ। ফলে সরকারি দল এবং বিরোধী দলগুলো বিশাল বিশাল গণজমায়েত করে দেশব্যাপী রাজনীতির একটা জিগির তৈরি করেছে যে সংস্কৃতি আমার কাছে বাংলাদেশের উন্নয়নের অন্তরায় মনে হয়। অথচ ব্যবসার জগতে, পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভয়ংকর রকম সংকোচন চলছে, এবং ব্যবসায়ী মহলে খানিকটা ঘোরাফেরা করলেই উদ্বেগের সঙ্গে জানতে পারি যে পণ্য আমদানীর জন্য এলসি খোলা যাচ্ছে না। অনেকগুলো শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। দুদক খোঁজ নিচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ লগ্নীকারী একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকের সম্পদের। বড় আশংকার ব্যাপার হচ্ছে অর্থনীতি নুব্জ হয়ে পড়তে পারে। সর্বস্তরের জনগণের বিরাট আস্থা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের গুনাবলীর ওপর। এবং তাঁর অপূর্ব দেশপ্রেম তাঁকে বাংলাদেশের দুঃসময়ে আরো শক্তিশালীভাবে হাল ধরতে উৎসাহিত করবে এটিই কামনীয়। জয় বাংলা। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। (পিআইডি ফিচার)

ড. মোহীত উল আলম সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; বর্তমানে ট্রিনিটির বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের আর্টস ও সোস্যাল সাইন্সেস অনুষদের ডিন ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক।